ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 05. No. 01. February 2011

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্ড়ারে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা (১৯৭৩-২০০৬): একটি বিশেণ্ডষণ

ড. মো: ফিরদাউস হোসাইন*

Abstract: Patronization of the different governments of Bangladesh toward the expansion of Islamic education has its historical background. Although the Islamic education system of Bangladesh is now in backbench, the concentration of governments in various regimes is highly traced out in an attempt of developing the techniques and methods of this education system. Most of the governments stride to formulate Islamic education in their own ways under the process of institutionalization that constraints the stable-road to Islamic education system. After all, the present condition of Islamic education system that has taken its systematic configuration due to the far-reaching initiatives taken by different governments through forming various Islamic educational institutions; such as Islamic Foundation Bangladesh, Madrashah Board, Islamic University etc. The main objective of this study is to explore the significant roles of these institutions in the expansion of Islamic education system under the surveillance of different governments of Bangladesh from its inception to present. Besides, the study also identifies the methods of these institutions in the expansion of Islamic education system in Bangladesh.

ভূমিকা: ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী শিক্ষার বিস্ড়র ঘটেছে।[১] বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্ড়ান আমলে গঠিত শিক্ষাকমিশনসমূহের রিপোর্টে মাদরাসা শিক্ষাকে বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ পৃষ্ঠপোষকতা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে গঠিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাদরাসা শিক্ষার দুটি স্ড়র বিলোপ সাধনের সুপারিশ করা হয়।[২] কিন্তু পরবর্তিতে এ কমিশন বাস্ড়বায়ন না হওয়ায় মাদরাসা শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ও পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীতে ইসলামী শিক্ষার ধারক মাদ্রসা শিক্ষাকে সরকারী পৃষ্ঠাপোষকতায় ব্যপক সংস্কার করা হয়। মাদরাসা বোর্ডকে শক্তিশালী করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে মাদরাসার স্ড়রসমূহকে সাধারণ শিক্ষার সমমান করা হয়। সরকারীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৩।

মাদরাসাসমূহে সরকারী অনুদান বৃদ্ধি করা হয় এবং কিছু মাদরাসাকে সরকারী করণ করা হয়। ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকেও সম্প্রসারিত করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষাকেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সরকার নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন ইসলামী এন. জি. ও কর্তৃক পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক ইসলামিক শিক্ষার কথা উলেণ্ডখ করা যেতে পারে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এ সকল ইসলামী শিক্ষা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ধরণের শিক্ষার বিস্ড়র মূলতঃ ইসলামী দা'ওয়াতেরই বিস্ড়র। তাই এ শিক্ষার প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকলে ইসলামী *শিক্ষা* সম্প্রসারণে সাফল্যের সম্ভাবনা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামী শিক্ষা বিস্ড়রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা: ইসলামী শিক্ষা বিস্ড়রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা মূলত: সংগঠিত হয়েছে নানারকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফাউ"শন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। নিম্নে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফাউ"শনসমূহের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা যা ইসলামী শিক্ষা বিস্ড়রে সাহায্য করেছিল তার স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশের ছোট-বড় অনেক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়ে অধ্যয়ন শুর" হয়েছে। তবে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দা'ওয়াহ বিষয়ে সর্বাধিক গুর"ত্ব দেয়া হয় সেগুলি হল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, দার"ল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম আন্ড়র্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলোতে দা'ওয়াহ বিভাগ নামে স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে। এখানে নিয়মিত অনার্স মাষ্টার্স শ্রেণীতে অধ্যয়ন এবং উচ্চতর গবেষণা চলছে।[৩] এছাড়া অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি এ নামে কোন বিষয় নেই। কিন্তু ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে বিভিন্ন কোর্সের সাথে দা'ওয়াহর ওপর স্বতন্ত্র কোর্স রয়েছে।

বাংলাদেশের বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষার প্রভাব বিস্ড়রে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের তদানীন্ড়ন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে এশিয়া মহাদেশে তিনটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা।[৪] কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এটির পদযাত্রা শুর" হয়। সে উদ্দেশ্য গুলো হল কলা ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সংযোজন ও সমন্বয় সাধন করা, ইসলামী শিক্ষা বিশেষতঃ মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করা, সম্পূর্ণ আবাসিক স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষা গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ইসলামী শিক্ষার ওপর গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং এক একদল প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী করা; যারা ইসলামী শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক শিক্ষার মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতঃ যোগ্যতা দিয়ে জনসম্মুখে নিজেদেরকে ইসলাম, আদর্শ ও মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক হিসেবে পেশ করতে পারবে।[৫] ইসলামী

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সব মহান উদ্দেশ্য অনেকটা বাস্ড়বে প্রতিফলিত হচ্ছে। তবে যদি এ বিষয়ে আরো বেশী নজরদারি করা যায়, তাহলে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা: পীর-আউলিয়ার খানকা, মসজিদ, মসজিদের চত্বর, আবার কোন কোন সময় কারো কাচারী বা বৈঠক খানায় মক্তব শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে মক্তব মাদরাসার সূচনা হয়।[৬] পরবর্তীতে সুলতানী আমল ও মোঘল আমলে আনুষ্ঠানিকভাবে মাদরাসা শিক্ষার ইমারাত গড়ে ওঠে। এজন্য বাংলার সুযোগ্য শাসকবৃন্দ ইলতুৎমিশ, ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী, শাহ দৌলা, বাদশাহ গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ, জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর, সম্রাট শাহজাহান প্রমুখ ব্যক্তিদের সরকারী বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তারা সকলেই ছিলেন বিদ্যানুরাগী। ফলে এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণে তাদের বেশ সুবিধা হয়েছিল। এই মাদরাসাগুলো কালের আবর্তনে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে আলীয়াহ ও কওমী মাদরাসা রূপ লাভ করে। এর মধ্যে কওমী মাদরাসা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই মানুষের অনুদানে চলছে। আর আলীয়া মাদরাসা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। যার সূচনা হয়েছিল বৃটিশ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোকষতায় গঠিত কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা দিয়ে। বর্তমানে দেশে যে সমস্ড় মাদরাসা শিক্ষা চালু রয়েছে তন্মধ্যে আলিয়া মাদরাসার সংখ্যা বেশী। অসংখ্য মুসলিম শিক্ষার্থী এগুলো থেকে আল-কুরআন, হাদীছ ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিরা। আলিয়া মাদরাসার কয়েকটি স্ড়র রয়েছে। যেমন ইতিদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল। সকল স্ড়রে আলাদা আলাদা পাঠ্যসূচী ও পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা কারিকুলাম পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ বোর্ডটি 'মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার সংগঠন, পরিচালন, তত্বাবধায়ন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করা হয়।[৭]

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৯০৫ টি মাদরাসা রয়েছে। এর মধ্যে কামিল মাদরাসার সংখ্যা ১২৬টি, ফাযিল মাদরাসার সংখ্যা ৯৮৫টি, 'আলিম মাদরাসা ৯৯৬টি এবং দাখিল মাদরাসা ৪৮২৬ টি।[৮] মাদরাসাগুলোর মধ্যে ৩টি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, সিলেট আলিয়া মাদরাসা এবং বগুড়া মোস্ড়াফাবিয়া মাদরাসা সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। আর বাকীগুলো বেসরকারীভাবে সরকারের অনুদানভুক্ত রূপে পরিচালিত হয়।

আলিয়া মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা পাঁচটি স্ড়রে বিন্যস্ড়। যথা: পাঁচ বৎসরের ইবতেদায়ী স্ড়র, পাঁচ বৎসরের দাখিল স্ড়র, দুই বৎসরের 'আলিম স্ড়র, তিন বৎসরের ফাযিল স্ড়র এবং দুই বৎসরের কামিল স্ড়র।[৯] ১৯৮৫ সাল থেকে দাখিলকে এস.এস.সি ১৯৮৭ সাল থেকে আলিমকে এইচ, এস, সি এবং ২০০৬ সালে ফাযিলকে ডিগ্রি ও কামিলকে মাস্টার্স সমমান হিসেবে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আলিয়া মাদরাসায় কুরআন, হাদীছ, আরবী, ফিকহ, বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, অর্থনীতি পৌরনীতি ইত্যাদি বিষয় পাঠ দান করা হয়। তাছাড়া সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগেরও ব্যবস্থা আছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সাধারণ ও

ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়তে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এ সকল মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্ড়ার করছে। এদের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা বিস্ড়ার লাভ করছে। অনুরূপভাবে কর্ম ক্ষেত্রেও মাদরাসা ছাত্ররা তাদের যোগ্যতা সততা ও নৈতিকতা দিয়ে মানুষের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বিত প্রচেষ্ঠায় এদেশে ইসলামী *শিক্ষা* সম্প্রসারণ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমাধিক্য: আল-কুরআন ও আল-হাদীছলব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে যে সাহিত্যকর্ম সম্পাদিত হয় তাকে ইসলামী সাহিত্য বলে।[১০] আরবী উর্দু ও ফারসী ভাষায় এ সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের ধর্মতত্ববিদগণ উপরোক্ত ভাষাত্রয়ে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নে অভ্যস্ড় ছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। এদেশের সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে তারা বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য প্রণয়নে ব্রতী হন। এ সাহিত্য সাধারণতঃ দু'ধরণের হয়ে থাকে। যথা-

১. অনূদিত ইসলামী সাহিত্য
২. মৌলিক ইসলামী সাহিত্য

প্রাচীন মুসলিম পন্ডিত এবং সমসাময়িক আন্ড়র্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুসলিম গবেষকদের অন্য ভাষায় প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থ আজ বাংলা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, প্রয়োজনীয় বিধি বিধান, বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকবিলায় আমাদের করণীয় প্রভৃতি বিষয় এ সকল গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু।

এছাড়াও এ দেশের প্রোথিতযশা 'আলিমগণ উপরোক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলো সহজ ভাষায় অথচ অনেক উচুঁ মানে রচিত। ফলে সমাজের সাধারণ ও প্রাগ্রসর সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা অতি অল্প ক্লেশে ইসলামের প্রকৃত রূপ জানতে পারে।

প্রথম দিকে বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর মত প্রতিষ্ঠান থেকে দু'চারটি এ ধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হত। পরবর্তীতে এ ধরণের গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের রেনেসাঁ শুরু হয়। ফলে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা দপ্তর, বাংলা একাডেমীসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ ধরণের গ্রন্থ ব্যাপক হারে প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়া শুধুমাত্র এধরণের গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য অনেক বেসরকারী সংস্থা ও প্রকাশানালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য হল- বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বাংলাদেশ এডুকেশন সোসাইট, আধুনিক প্রকাশনী, খায়রুন প্রকাশনী, আহসান পাবলিকেশন্স, হামিদিয়া লাইব্রেরী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা দপ্তরও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এতদসংক্রান্ড় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে সর্বস্ড়রের পাঠক-পাঠিকা যেমনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তেমনি ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্য তাদের হৃদয় মন প্রস্তুত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা: ইসলামী গবেষণা, প্রচার, প্রসার ও মুসলমানদের সমগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ[১১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মোকররম সোসাইটি[১২] এবং ইসলামিক একাডেমী[১৩] নামক দুটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। এ দুই সংস্থার সমুদয় সম্পদ, দায় দায়িত্ব এবং কর্মসূচী নবগঠিত ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত হয়।[১৪] ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্ণরের ওপর এটি পরিচালনার ভার ন্যস্ড় হয়। ১৯৭৯-৮০ সনে চারটি বিভাগীয় এবং তিনটি জিলা শহরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এগুলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা হিসেবে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়।[১৫] বর্তমানে দেশের ৬৪ টি জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় ও এর শাখা গুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী ইসলামের মৌলিক আদর্শ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করে আসছে। এর গৃহীত কর্মসূচীগুলোর মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য কতিপয় কর্মসূচী নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

দ্বীনি দা'ওয়াতে ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালনা: এ বিভাগের অন্যতম কাজ হল, রাসূল (সা.), সাহাবী, বিভিন্ন মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণে এবং ইসলামের মৌলিক ও গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা, বায়তুল মোকররম মসজিদে তাফসীরে কুরআন ও দারসে হাদীছসহ বিষয় ভিত্তিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা, সামাজিক শৃংখলায় ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযের ব্যবস্থা করা, ইসলামী শিক্ষার উত্তরণে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ইত্যাদি। এই বিভাগের সক্রিয় উদ্যোগে প্রতি বছর ৩০টি তাফসীর মাহফিল, ৬০টি মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান, ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান, ৯০টি মাসআলা-মাসায়িল সংক্রান্ড় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এছাড়াও দু:স্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষা প্রদান ও তাদের ব্যবহার উপযোগী একটি লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে।[১৬]

যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠা: মুসলিম গরীব ও অসচ্ছল জনসাধারণকে সরকারীভাবে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান কল্পে ১৯৮২ সালের ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন ও তৎসঙ্গে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহি কমিটি নির্ধারণ করা হয়। দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এ কমিটির সদস্য। সরাসরি যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে যাকাত বোর্ড যে সমস্ড় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে সে গুলো হল, দুস্থ ও দরিদ্র শিশুদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য টঙ্গীস্থ শিশু হাসপাতাল পরিচালনা করা, অসহায় বেকারদেরকে কর্মক্ষম করে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ২৫টি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ও

পরিচালনা করা, দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান করা, দুস্থ বিধবাদেরকে হাঁস-মুরগী পালনে আর্থিক সহায়তা দান করা ও ইয়াতীম-দুস্থদের সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসা ইত্যাদি।[১৭]

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন: দেশের কোমল মতি শিশুদেরকে ইসলামী অনুকরণে অন্যান্য সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রচলন সত্যিই সন্ড়োষজনক। ১৯৯২ সালে এ প্রকল্পটি শুর" হয়। বর্তমানে এটি দেশের ৬৪টি জেলার ৮৬৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।[১৮] এর মাধ্যমে মসজিদ পার্শ্বস্থ মহলণ্ডার শিশুরা একদিকে যেমন শিক্ষার সন্ধান পাচ্ছে ঠিক তেমনি অন্যদিকে মুসলিম হিসেবে নিজের আসল পরিচয় ও অতীত ইসলামী ঐতিহ্যের কথা জানতে পারছে। তারা নামায, রোজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনের বাস্ড়ব প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে বড় হচ্ছে।

অনুরূপভাবে এ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে পনেরোর্ধ্ব নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অক্ষর-জ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করছে। এছাড়াও তারা ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে সাথে পরিবার, সমাজ, নীতি-নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারছে। ফলে তারা অসামাজিক ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হচ্ছে। এ পকল্পের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০০৩ সাল পর্যন্ড় ১৬ লাখ ৪৮ হাজার ৮ শত ৩০ জন শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি এ প্রকল্পের অধীনে শিক্ষাগ্রহণ করেছে।[১৯]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা: ইসলামী সাহিত্যের ওপর গবেষণাসহ সর্বসাধারণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুবিধার্থে একটি কেন্দ্রীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে কুরআন শরীফ ও বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থসহ ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মুসলমানদের অবদান, ইতিহাস, দর্শন, আইন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচিত এক লক্ষ বা তদাতিরিক্ত গ্রন্থাবলী সমৃদ্ধ এ লাইব্রেরী।[২০] পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এর শাখা বিশেষে দেশের সবক'টি জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশ: এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক অনবদ্য কীর্তি। বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত গুর"ত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী মন্থন করে বাংলা ভাষায় প্রকাশের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করে। এর বাস্ড়বতায় লীলাভূমিতে পদার্পণ করে ২ খ" সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ এবং ২৭ খ" সমাপ্ত বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। ইতোমধ্যে বৃহত্তর বিশ্বকোষের ২৬টি খ" প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া নবী (আ.), রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের জীবন-কর্ম সম্বলিত সীরাত বিশ্বকোষ নামে ২২ খ" সমাপ্ত আরেকটি প্রকল্পের কাজ শুর" করেছে এ ফাউন্ডেশন। ইতোমধ্যে এর ৮টি খ" প্রকাশিত হয়েছে।[২১]

ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা: দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকার সুস্থ মনের চাহিদা পূরণে সঠিক সময়ে ও নির্ধারিত পন্থায় ইসলামী বই-পুস্ড়ক ও পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করা আবশ্যক। এদিকে দৃষ্টিপাত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছে।

যাতে স্বল্প সময়ে ইসলামী বই-পুস্ড়ক প্রকাশ করে পাঠক মহলের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়।

ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ফাউন্ডেশনের একটি স্বতন্ত্র ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন ইসলামের মৌল বিষয় দর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আইন, বিচার প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়া যুগ ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিষয়ের ওপর গবেষণার কাজে গবেষকদের উৎসাহদান কল্পে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ এবং তর"ণ সমাজের মনে ইসলামের ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে ম্যাগাজিন প্রকাশে প্রকাশনা বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। এ সকল পত্রিকার মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সবুজ পাতা, অগ্রপথিক উলেণ্ডখযোগ্য। বর্তমানে উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রায় দু'হাজারেরও অধিক শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[২২]

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ইসলামী *দা'ওয়াত* সম্পর্কিত বেশীর ভাগ গ্রন্থই বিদেশী ভাষায় রচিত। এ সকল গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সংকলনের জন্য ফাউন্ডেশনের একটি বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগ থেকে তাফসীর, হাদীছ ও সীরাত বিষয়ক দু'শতাধিকেরও বেশী গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রদান: পুরস্কার মানুষের জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ডেকে আনে। এটা তার প্রাপকের মাঝে স্বীয় কর্মক্ষেত্রে আরো বেশী প্রেরণার সৃষ্টি করে। এ কারণে ফাউন্ডেশন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সকল আয়োজন এবং মুসলিম জাতীয় জীবনের প্রকারান্ড়র ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮২ সালে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার" ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ, সাংবাদিকতা, শিল্প কলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে প্রতি হিজরী সনে এ পুর"স্কার প্রদান করা হয়।[২৩]

ক্যাসেট তৈরীর কর্মসূচী গ্রহণ: ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় সর্বসাধারণের কাছে ইসলামী শিক্ষা পৌঁছে দেয়া যত সহজ, অন্য কোন উপায়ে তত সহজ নয়। টেপ রেকর্ডার ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার অংশ বিশেষ। এটি একটি অত্যন্ড় সহজ উপকরণ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের প্রখ্যাত ক্বারীগণের সুললিত কণ্ঠে কুরআন মজীদের কিরআত, প্রশিদ্ধ 'আলিমগণের তারজমাহ ও তাফসীর সম্বলিত ক্যাসেট তৈরী করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তারা বিতরণ ও সূলভ মূল্যে বিক্রি করছে।

গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা: এ বিভাগের উদ্যোগে দেশের গবেষকরা ইসলামের মৌলিক ও গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের গবেষণালব্ধ বিষয়াবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এ যাবত গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৫০টি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হল, বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশ বরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্ড়াবিদগণের জীবন ও কর্মপদ্ধতি, ফাতওয়া ও মাসাইল, আল-কুরআনে অর্থনীতি, সমাজ নীতি ও বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান ইত্যাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ। এছাড়া প্রবন্ধকারদের প্রবন্ধ সমষ্টি "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা" নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা এ বিভাগ কর্তৃক আত্মপ্রকাশ করছে।[২৪]

জামি'আতুল ফালাহ মসজিদ কাম ইসলামিক কেন্দ্র সম্প্রসারণ: ইসলামের সূচনাপর্বে ইসলামী দা'ওয়াহ প্রচারে চট্টগ্রামের ভূমিকা অপরিসীম। এখান থেকে তা মন্থর গতিতে সমগ্র বাংলাদেশে বিস্ড়ার লাভ করে। ঐতিহ্যের ধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের উৎসাহী সমাজ সেবীগণ সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী আদর্শের প্রচার ও জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দ্যেশে "জামি'আতুল ফালাহ" নামে একটি আন্ড়র্জাতিক মানের মসজিদ ও ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। একে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের দামপাড়ায় ১২ একর জমি দান করা হয়। সরকারী-বেসরকারী ও বিদেশী সংস্থার দানে মসজিদের আংশিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন কাজ দ্র"ত গতিতে এগিয়ে চলছে।[২৫]

মসজিদ ভিত্তিক ইসলামী পাঠাগার স্থাপন: এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি অনন্য অবদান। এতে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে রচিত মৌলিক ও গবেষণা গ্রন্থাদি রয়েছে। মসজিদ মুসলিম জাতির দৈনন্দিন জীবন চলার সাথী। এর পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন কর্মসূচী ১৯৯২ সালে শুর" হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী পাঠাগারের সংখ্যা ৩৩৭০টি। অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি মসজিদে এ পাঠাগার স্থাপনের এক যুগান্ড়কারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ।[২৬]

ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা: ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিনামূলে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা গরীব ও দুস্থদেরকে জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বনে সহায়তা করা, গরীব ও দুস্থদেরকে জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বনে সহায়তা প্রদান পূর্বক তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা, নিরংকুশ চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, নিরক্ষর ব্যক্তিদেরকে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা প্রভৃতি পদক্ষেপ সে সকল কার্যক্রমের আওতাভূক্ত। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৮৩ সনে দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলসমূহে ইসলামিক মিশন কেন্দ্র স্থাপনের কাজে হাত দেয়া হয়। বর্তমানে দেশের ২৬টি জেলায় ২৯টি মিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করাই এদের একমাত্র কাজ।[২৭]

এই মিশনের আওতাধীন আরও দুটি কাজ যেমন মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মুবালিণ্ডগ প্রশিক্ষণ শুর" হয়েছে। এর মধ্যে মুসালিণ্ডগ প্রশিক্ষণের কাজ হল মসজিদ এবং বারান্দায় পরিচালিত মাদরাসায় অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে জানতে পারে এসব বিষয়ে শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করে তোলা।[২৮]

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা: আলণ্ডাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার সামনে মাথা নত করার একমাত্র মাধ্যম হল মসজিদ। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ১,৯৬,৪০০টি মসজিদ রয়েছে। এতে নিয়োজিত আছে প্রায় চার লক্ষাধিক ইমাম ও মুয়াজ্জিন। এদেরকে দ্বীন ইসলাম প্রচারের স্বার্থে ইসলামের নানাবিধ বিষয়ে দক্ষ করে তোলার অভিপ্রায়ে ফাউন্ডেশন ১৯৭৯ সালে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের অংশগ্রহণপূর্বক সমাজকে

অন্যায়, দুর্নীতি ও নিরক্ষরতার হাত থেকে রক্ষা করে একটি সুন্দর সুশৃংখল আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে তাদেরকে পরাদর্শী করে তোলাও একাডেমীর লক্ষ্য এবং একাডেমীর বিভিন্ন দপ্তরে যারা কর্মরত রয়েছে তাদেরকে ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন ও নৈতিকতাবাদী গড়ে তোলা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বহির্ভূত নয়।[২৯]

মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট: ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানের ওপর অবশ্য পালনীয় বিষয়। আর ইসলামী জ্ঞান বিতরনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদরাসা শিক্ষকদের ভূমিকাই মুখ্য। বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মাদরাসা। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও পূর্বে মাদরাসার শিক্ষকদের মান উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সাধারণ শিক্ষা ব্যাবস্থায় পরিচালিত স্কুল কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকলেও মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। ফলে মাদরাসা শিক্ষকগণ যুগোপযোগী শিক্ষায় ছাত্রদেরকে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হত। কিন্তু সম্প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার গাজীপুরে মাদরাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে মাদরাসা শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের যোগ্য করা হচ্ছে। এতে মাদরাসার শিক্ষকগণ নিজেরাও বর্তমানে আন্ড়র্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় ইসলামী *দা'ওয়াত*কে সম্প্রসারিত করতে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারছেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে যোগ্য করে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন থেকেই ইসলামী শিক্ষার বিস্ড়র লাভ করতে থাকে যা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তবে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ইসলামী শিক্ষার বিস্ড়র আরও ত্বরন্বিত হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী শিক্ষার বিস্ড়রে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলি এর শিক্ষাব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছে, যা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়। এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ভূমিকা আজও অব্যাহত রেখেছে।

তথনির্দেশিকা

১ ড. মো. আব্দুস সাত্তার, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পৃ. ৩৫-৪১।

২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৩ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৪ "বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা: সমস্যা ও সম্ভাবনা", পৃ. ১৩০।

৫ *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পৃ. ১১৩-১১৫।

৬ *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পৃ. ৪১-৪২।

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১।

৮ ড. মো. আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯।

৯ *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬-১৩৭।